উপসংহার

উনিশ শতক ভারতবর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুশীলনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সময়। মধ্যযুগকে বিদায় দিয়ে আধুনিক যুগের আবাহনী ধ্বনিতে আলোড়িত হয় বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডার। কাব্যপ্রথার পরিবর্তে প্রচলিত উপন্যাসের ইউরোপীয় রীতিনীতির ঢঙে লালিত শিশু সাহিত্য পাঠক সমাজকে নতুন উদ্দীপনার আলোকে চমকিত করে। উনিশ শতকে বঙ্গসাহিত্যের চাকচিক্য পাঠক সমাজের ধাঁধানো চোখের দৃষ্টিতে তৈরি করে নিল এক দেওয়াল, যে দেওয়ালের একপাশে ছিল সমাজের উঁচুতলার মন ভোলানো নানা বাহিনি আর আরেকপাশে পড়ে রইল শোষিতদের জীবনব্যথা। চক্ষু দৃষ্টি যেন সেই সময় দেওয়ালের ওইপাশ দেখতেই পায়নি। অবহেলিত জীবনকথা সাহিত্যে উঠে আসার কোনো সুযোগ পেল না তখন, তবে অবহেলিতরা সেসময় সাহিত্যে উঠে আসার সুযোগ না পেলেও পুঞ্জীভূত হতে থাকল চাপা উত্তেজনা। ফলে স্বাধীনতার পরপর ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগের আনুষ্ঠানিক প্রারম্ভ দেখা দিলেও প্রকৃত অর্থে সাহিত্যে তা অন্ধকারযুগ হিসেবেই পরিচিতি লাভ করে। ষাটের দশক থেকে অন্ধকারযুগের সীমা যখন লঙ্ঘন হওয়ার সময় ঠিক তখনই বঙ্গসাহিত্য ভুবনে প্রয়োজন পড়ল বিনির্মাণের। কিছু তত্ত্বসমাগমের মাধ্যমে এবং বাস্তবতার আগমনে সাহিত্যের নবনির্মাণ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই সময়ের স্রোতধারায় সত্তরের জলবিভাজন রেখা অঙ্কিত হয়। সমসাময়িক সাহিত্যিকরা স্বপ্ন দেখলেন এক নির্মল সমাজের, যেখানে থাকবে না কোনো শোষণ আর থাকবে না কোনো বিভাজন। সাহিত্যে উঁচু তলার কোনো ক্ষমতাশীল ব্যক্তির কথা না উঠে, উঠে আসবে সেই সমস্ত মানুষের কথা যারা সাধারণ এবং দিনের পর দিন যারা শোষিত হয়ে যায়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর সত্তরের জলবিভাজনে

সাহিত্য ফিরে পেল তার আপন সত্তা। চাকচিক্য মুখোশের পরিবর্তে সমাজের নগ্ন বাস্তব সাহিত্যে কেন্দ্রীভূত হল। ঔপনিবেশিক মোহমুক্তি সাহিত্যের প্রাণ ফিরিয়ে দিল। কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়, প্রফুল্ল রায়, ভগীরথ মিশ্র, আফসার আমেদ, অমর মিত্র প্রভৃতি সাহিত্যিকরা বিনির্মাণের মাধ্যমে সাহিত্যকে নতুন রূপ দিলেন। সাহিত্যিক দেবেশের উপন্যাসে সাহিত্যের এই নবরূপই দেখা যায়। গবেষণা সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায় থেকে সাহিত্যিক দেবেশের নির্বাচিত কিছু উপন্যাসে উল্লেখিত বিষয় প্রতিফলিত হয় এবং সেই প্রতিফলনের সাথে সাথে ধরা দেয় ঔপন্যাসিকের দুঃসাহসিক ক্ষমতা ও অসাধারণ লেখনী শক্তির। উপন্যাসের ভিন্নতা সমাজের সমগ্র দিকে আলোক ফেলে ফলে তাঁর সাহিত্য ভুবনে এক ঘেয়েমির বালাই থাকে না। তৃতীয় অধ্যায়ে সময়ের স্বল্প পরিসরের কারণে নির্বাচিত কয়েকটি ছোটগল্প ও কয়েকটি উপন্যাসের সাধারণ পরিচয় নিয়ে আলোচনা হয়, নিম্নবর্গীয়দের আত্মকথন, পরিমাপহীন শোষণমাত্রা, সমাজের কঠোর বাস্তব গল্প উপন্যাসের সাধারণ পরিচয়েই ভেসে উঠে। বিভিন্ন রকমের জৈবিক ও সামাজিক বাস্তব ঔপন্যাসিক দেবেশের কথাবিশ্বের উপজীব্য নিয়ম। 'যযাতি' উপন্যাসের প্রতিটি আলাদা আলাদা চরিত্রে আত্মকথনে একদিকে যেমন প্রতাপতত্ত্বের বিস্ফোরণ ঘটে অন্যদিকে তেমনি একই বাক্যে অনেকার্থ দ্যোতনার আত্মপ্রকাশ ঘটে। 'নভেলজোড়' উপন্যাসে কল্পনার এক গভীর জালে বাস্তবতার উন্মোচন ঘটে এবং 'জন্ম' ও 'সহমরণ' উপন্যাস দুটো মানবজীবনের এমন কতগুলো সময়কে চিহ্নিত করে যেখানে মানুষের চোখের সামনে সমস্ত অপ্রিয় ঘটনা ঘটে যায় অথচ মানুষের হাত বাধা থাকে। নিষ্ক্রিয় হাত তাদের সমস্ত উপায় খুঁজে বার করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে ঔপন্যাসিক দেবেশের চারটি বৃত্তান্ত ও চারটি প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করি। এই অধ্যায়ে বৃত্তান্ত ও প্রতিবেদন আলোচনায় অধিক গুরুত্ব আরোপ হয় কারণ ঔপন্যাসিকের অন্যান্য রচনা থেকে এইগুলোর বিশেষতা অধিক প্রকটিত হয়। ঔপন্যাসিকের সাহিত্যভুবনের একসময়ের জনপ্রিয়িতা অর্জনকারী 'বৃত্তান্ত' ও 'প্রতিবেদন' শব্দগুলো যে উপন্যাসের ক্ষেত্রে যথার্থভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে কিংবা

এর চেয়েও অধিক গভীরতা অর্জন করেছে তার সাক্ষাৎ মিলে উপন্যাসগুলোর বিস্তৃত আলোচনায়। 'প্রতিবেদন'-এর আক্ষরিক অর্থ রিপোর্ট বা বিজ্ঞাপন, যদিও চারটি প্রতিবেদনের আলোচনায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের অতিরিক্ত ও বহুকিছু প্রমাণিত হয় তথাপি বিজ্ঞাপন বা রিপোর্ট হওয়ার লক্ষণ ও এতে স্পষ্ট। ঔপন্যাসিকের 'প্রতিবেদন' শব্দের ব্যবহার এবং অকল্পনীয় বাস্তববোধ প্রতিবেদনগুলোকে বাকী উপন্যাসগুলো থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে। অপরদিকে বৃত্তান্তগুলোও তাদের বৃত্তান্ত হওয়ার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে জীবন ও সমাজের নগ্নতাকেই তুলে ধরে 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'—এ বাঘারুর জীবনের একলা সংগ্রাম ও 'সময় অসময় বৃত্তান্ত'-এ রাষ্ট্র কর্তৃক ঘটিত ধ্বংস লীলা বৃত্তান্তগুলোকে বাকী উপন্যাস থেকে অনায়াসেই স্বতন্ত্রতা দান করে। দুঃসাহসী ঔপন্যাসিক দেবেশ মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণির বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে সরাসরি তার বৃত্তান্ত ও প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। 'দাঙ্গার প্রতিবেদন' ও 'সময় অসময় বৃত্তান্ত'-এ যে লোমহর্ষক ঘটনা বিবৃত হয় তাতে সাহিত্যের নবরূপ ধরা দেয় যে রূপে নায়ক হয় সমাজের সাধারণ নিম্নবর্গীয় শ্রেণির প্রতিনিধিরাই। এমন কী লেখক তাঁর এই রচনাগুলোকে উৎসর্গ করলেন সেই সমস্ত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে যারা কোনোদিন এই বৃত্তান্তগুলো পড়বে না। নিঃস্বার্থ জনদরদী লেখক তাঁর বৃত্তান্তও প্রতিবেদনে বিকল্প ও প্রতিস্পর্ধী পরিসর নির্মাণ করেন শোষিত অবহেলিত মানুষদের ন্যায় প্রতিষ্ঠার তাদিগেই। এক নির্মল পৃথিবী নির্মাণের স্বপ্ন দেখেই ঔপন্যাসিক দেবেশ তাঁর সাহিত্য ভুবন নির্মাণের যাত্রা পথে এগিয়ে যান। তিনি বঙ্গসাহিত্যিক বলে নিজেকে বঙ্গভূমির ভূখণ্ডে আবদ্ধ রাখেননি এতে তার মানবদরদী মনের এবং বিশ্বপ্রেমিকের পরিচয় মিলে। ভারতবর্ষের যত্রতত্র ঘটে যাওয়া ঘটনাকে আটটি প্রতিবেদন ও বৃত্তান্তমূলক রচনায় স্থান দিয়ে সর্বসাহিত্যের সাহিত্যিক হওয়ার প্রতিনিধিত্ব তিনি অর্জন করেন। সাহিত্য একাদেমী পুরষ্কার প্রাপ্ত 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'—এর বাঘারুর জীবনসংগ্রাম ও পারিপার্শ্বিক অন্যান্য ঘটনাগুলো সমালোচনার চরম শিখর আয়ত্ত করে যেখানে লেখকের ক্ষমতাশালী লেখনীর সুনিপুণ ক্ষমতা ধরা দেয়।

গবেষণা সন্দর্ভের আপাত সমালোচনায় ঔপন্যাসিকের নির্মল পৃথিবী গড়ে তোলার সচেষ্ট অভিযান পরিস্ফুট। সমাজের প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো সাহিত্যে প্রতিফলনের মাধ্যমে যাতে মীমাংসাহীন পথ ত্যাগ করে তাই ঔপন্যাসিকের চেষ্টায় ধরা দেয়। ঔপন্যাসিকের চেষ্টা ও এই গবেষণার পর পাঠক প্রতিক্রিয়ায় যদি তিলমাত্র আলোড়ন দেখা যায় তবেই এই গবেষণার সার্থকতা অর্জন হয়। সময়ের স্বল্প পরিসরে গবেষণাকর্মকে সংক্ষিপ্ত বলে মনে হতে পারে। তাই আলোচনার গণ্ডী এখানেই থেমে যায় না। মানবিক মূল্যবোধে চেতনার জাগরণের চেষ্টায় আপাত সমাপ্ত এই গবেষণাকর্মটি পরবর্তীতে আরও বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এক সুন্দর নির্মল পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে সন্দর্ভটিকে এখানেই আপাত সমাপ্ত ঘোষণা করা হল।